ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1239-1248
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.126

রবীন্দ্র জীবনে প্রেম ও প্রকৃতি

সুমন্ত রবিদাস, *স্বাধীন গবেষক, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.05.2025; Accepted: 17.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

If we look at Rabindranath's life, we can see how much space 'love and nature' occupied in his life. From a young age, it can be seen that Rabindranath used to sit on the second floor and watch the scenery of nature outside. Even as he grew up, it can be seen that when the shadow of happiness and sorrow fell on Rabindranath's life again and again, Rabindranath found a place to live in nature. Even though his first love came in the form of Anna Tarkhar, it did not last long. Again, when he lost his mind for the doctor's daughters while studying in England, he returned home with a broken heart and forgot everything. Rabindranath wanted to live in the love of Kadambari Devi, making Kadambari the 'pole star' of his life. But when Kadambari Devi committed suicide, the poet lost the strength to live in life again. At this time, the love of nature and his wife Mrinalini showed the poet the way to live. Even when his wife died, it is seen that love for nature, people, and country inspire the poet to live again. In this way, it can be seen that when the dark night approaches again and again in the poet's life, 'Love and Nature' shows the poet a new way to live. From the beginning to the end of his life, this 'Love and Nature' was inextricably linked with the poet's life. The image of this 'Love and Nature' has emerged again and again through the poet's various writings. This shows how much space 'Love and Nature' occupied in Rabindranath's life.

Keywords: Rabindranath, Kadambari Devi, Mrinalini Devi, Anna Tarkhar, love and nature, pole star, Chitra, Chaitali, Sonar Tari

আমরা যদি রবীন্দ্র জীবনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল। যেটা আমরা তাঁর পরবর্তীতে বিভিন্ন লেখনীর মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। প্রেম ও প্রকৃতি রবীন্দ্র জীবনে যে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা আমরা ‘জীবনস্মৃতিতে’ স্পষ্টই দেখতে পাই। তাঁর পরিণত বয়সের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ ‘জীবনস্মৃতি’তে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা চাকরদের অধীনেই কেটেছে। বাড়ির পিতা- মাতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলে বা মেয়েদের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না। আবার বাড়ির বাইরে এমনকি ভেতরেও ইচ্ছে মতো যাওয়া নিষেধ ছিল। ঠিক এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করে নেয় প্রকৃতি। বাইরে যেহেতু যাবার অনুমতি ছিল না, সেহেতু রবীন্দ্রনাথ জানালা দিয়ে ঘরে বসেই পুকুরের স্নান করার দৃশ্য, প্রকাণ্ড বটগাছের আলো- আঁধারির খেলা, নারিকেল বাগানের দৃশ্য প্রভৃতি প্রকৃতির দৃশ্যগুলো দেখতেন। সেই ছোটবেলার দেখা প্রকৃতির ছবি রবীন্দ্রনাথের মনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যের ‘পুরানো বট’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সেই বটগাছের যে বর্ণনা দিয়েছেন–

"নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট।...
মনে কি নেই সারাটা দিন বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইতে চেয়ে অবাক দুনয়নে?"[১]

শুধু 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেই নয়, পরবর্তীতে লেখা 'সোনার তরী' কাব্যের 'দুই পাখি' কবিতায় ছোটবেলায় প্রকৃতিকে দেখার যে বর্ণনা দিয়েছেন-

"খাঁচার পাখি সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,"[২]

এই দুই কবিতা থেকেই বোঝা যায় প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম কতটা ছিল, আর সেটা ছোট থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল।

দাদা সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুর কন্যা আন্না তরখড় প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে একটা আকর্ষণ ছিল এবং এই মেয়েটিও যে কবিকে ভালোবেসেছিলেন, সে ব্যাপারে কবি নিজেই বলেছেন,

"সে মেয়েটিকে আমি ভুলিনি বা তার সে আকর্ষণকে কোন লঘু লেভেল মেরে খাটো করে দেখিনি কোনদিন।..."[৩]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই তরুণীর যে একটা গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার কথা রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য় বলেছেন,

"আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি।... আদর আবদার করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন।"[৪]

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে ওই অন্না-ই ছিল কবির আদর- আবদারের জায়গা। যার কাছে কবি তাঁর কবিত্বের কথা ঘোষণা করতে পারতেন অনায়াসেই। 'কবি কাহিনী' প্রকাশিত হলে কবি আন্নাকে তা উপহার দেন। আন্নাকে উদ্দেশ্য করে কবি 'শুনো নলিনী', 'খোলো গো আঁখি' প্রভৃতি গানগুলি নলিনীর নামে তার উদ্দেশ্যেই রচনা করেন। শুধু গান নয়, নলিনী নাম দিয়ে কবি অনেক কবিতাও রচনা করেছেন। 'নলিনী' কবিতায় কবি আন্নার উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর করে
ভালো সেকি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,"[৫]

'দামিনীর আঁখি কিবা' কবিতায়ও কবি বলেছেন-

"ও আমার নলিনী লো, বিনয়িনী নলিনী
রসিকতা তীব্র অতি
নাই তার এত জ্যোতি
তোমার নয়নে যত নলিনী লো নলিনী।"[৬]

এখান থেকে বোঝায় যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মনেও আন্নার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। সেই ভালোবাসার জন্যই তো নিজের পছন্দের নাম 'নলিনী' দিয়ে নিজের আন্নার প্রতি ভালো লাগার কথা কবিতার মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে গেছেন বারবার। তাহলে বলা যেতে পারে, কবির জীবনে প্রথম প্রেম এই 'আন্না তরখড়' রূপেই এসেছিল আর রবীন্দ্রনাথের মনও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। নলিনীর চপলতা, কচি হাত, নয়নের অপরূপ জ্যোতির যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায় কবির মনের মধ্যেও নলিনীর প্রতি ভালোবাসা ছিল। আর

ভালবাসা ছিল বলেই এত রূপ- গুণের বর্ণনা করেছেন কবি। আবার ভালোবেসে নিজের পাছন্দের নাম 'নলিনী'ও দিয়েছিলেন। কবিতা, গান, বিভিন্ন লেখনীর মাধ্য দিয়ে কবি সেই কথাই বলে গেছেন।

কবি যখন বিলেতে গিয়েছিলেন, সেখানে ডাক্তার স্কটের বাড়িতে যখন ছিলেন, তখন স্কটের দুই কন্যা যে কবির প্রতি অনুরক্ত ছিল, কবিকে ভালোবেসেছিল সে কথা কবি নিজেই বৃদ্ধ বয়সে এসে বলেছেন,

> "দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই- কিন্তু তখন যদি সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।"[৭]

কবিও যে অনুরক্ত ছিল মেয়ে দুটির প্রতি তার পরিচয় 'দুদিন' কবিতায় রেখে গেছেন—

> "কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
> একটি কোমল প্রাণ ভেঙে রেখে গেনু।"[৮]

কবি লন্ডনে দুদিনের জন্য এসে যে মেয়ে দুটির মায়ায় পড়েছিলেন তার পরিচয় এই কবিতাটির মধ্যেই পাওয়া যায়। তাইতো বারো বছর পরে কবি আবার লন্ডনে তাদের খুঁজতে গিয়েছিলেন। আমরা যাকে ভালোবাসি মনে মনে আমরা তারই ছবি আঁকি, রূপ- গুণের বর্ণনা করি। সেগুলোই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যখন এই দুটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সেই দুই মেয়েকে রেখে ভাঙা মন নিয়ে কবিকে আবার বিলেত থেকে ফিরে আসতে হয়। বিলেতে থাকাকালীন কবি 'ভগ্নহৃদয়' নামে এক কাব্যগ্রন্থ রচনা শুরু করেন। এই গ্রন্থটিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কবির মনে এক ব্যথার ভাব জন্ম নিয়েছিল। বলা যেতে পারে বিলেতে যে ডাক্তারের দুই মেয়ে কবিকে ভালোবাসত, সেই ভালোবাসার অপূর্ণতা থেকেই সেই ব্যথা–

> "ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না আর!
> মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।"[৯]

বিলেতে যেই 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের সূচনা, দেশে ফিরে তার প্রকাশ। এই কাব্যের 'উপহার' এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর খেলার সঙ্গী, কাব্যের সঙ্গী কাদম্বরী দেবীকে কবি ভালোবাসার স্বরূপ লিখেছেন–

> "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
> এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।...
> চরণে দিনু গো আনি - এ ভগ্নহৃদয়খানি...।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে ভালোবেসে ভাঙা হৃদয় নিয়ে ফিরে এসে কাদম্বরী দেবীর ভালোবাসায় তা ভুলতে চেয়েছিলেন। কারণ আমরা জানি কবির প্রতিটি আশা -ভরসার- ভালোবাসার মূলে ছিল তাঁর বৌদি। তাইতো জীবনের 'ধ্রুবতারা' বৌদিকেই করতে চেয়েছিলেন, যাতে করে আর কোনো দিন কারো ভালোবাসায় পথ হারা না হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসলে সকলে করুণার চোখে দেখলেও কাদম্বরীই তাকে আশা - ভরসা যুগিয়েছিল। সেই কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যার চেষ্টা করলে কবি মনে গভীরভাবে আঘাত পান। সাত বছর বয়স থেকে যার সঙ্গে মনের সম্পর্ক, যে সমস্ত আশা- ভরসার কেন্দ্রস্থল, তার আত্মহত্যার চেষ্টাতে কবি ব্যথিত হয়ে পড়ে। কবি তাঁর বৌদিকে 'তারকা' বলে সম্বোধন করে 'তারকার আত্মহত্যা ' কবিতায় প্রিয় মানুষের আত্মহত্যাতে সেই ব্যথার কথায় বলেছেন–

> "হে তারকা ছুটিতেছ আলোকের পাখা ধরে,
> তোমারে শুধাই আমি, বলগো বলগো মোরে,
> তুমি তারা, রজনীর কোন গুহা মাঝে যাবে?"[১১]

'সুখের বিলাপ' কবিতায় কবিকে ছেড়ে দাদা- বৌদিরা চলে গেলে কবি তীব্র দুঃখে বলে ওঠে–

> "কেহ -কেহ- কেহ নাই মোর।...
> ভালোবাসা গেল কি চলিয়া?
> আবার কি দেখা হবে রে?"[১২]

এখান থেকেই বোঝা যায় কবি তাঁর বৌদিকে কতটা ভালোবাসত। কতটা মনের সম্পর্ক ছিল বৌদির সঙ্গে। কবি কতটা ব্যথা পেয়েছিল এই কবিতাগুলোর মধ্যে দিয়েই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার চেষ্টা এবং

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে নিয়ে কলকাতার বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও গেলে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একাই হয়ে পড়েন। জীবনের সঙ্গী বিচ্ছেদে কবি ব্যথিত হয়ে পড়ার ব্যথা থেকেই জন্ম নেয় 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' এর কবিতা গুলো।

দীর্ঘদিন প্রায় বছরখানেক সেই ব্যথা ভুলতে কবির সময় লেগে যায়। দীর্ঘদিন মনো দুঃখে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকার পরে অবশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজের মনকে প্রশ্ন করলেন–

"আর কতদিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।"[১৩] (আহ্বান সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত)

নিজের মনকে প্রশ্ন করার পরে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রকৃতির মধ্যে মনের শান্তি খুঁজে পেলেন। তাই 'নির্ঝরে স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি বললেন–

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান!"[১৪]

প্রকৃতি যে রবীন্দ্রনাথের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা এখান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। কবি যখন ব্যথার সাগরে ডুবে গিয়েছিলেন, তখন প্রকৃতি কবিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। প্রকৃতির মধ্যেই কবি মনের শান্তি, মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাইতো রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাত সঙ্গীত' অধ্যায়ে বলেছেন, "সদর স্ট্রীটের বাড়িতে থাকিবার কালে একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাইলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।..."[১৫] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো ভালোভাবে কেমন করে অন্ধকার থেকে উত্তরণের পথ, মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন তা তিনি এই নাটকে সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। সন্ন্যাসী যেমন অন্ধকার গুহাকেই জীবনের সবকিছু মনে করেছিল, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও কাদম্বরীর আত্মহত্যার চেষ্টার পর দুঃখকেই জীবনের সবকিছু মনে করেছিলেন। সন্ন্যাসী যেমন এক বালিকার স্পর্শে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর জগতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে, প্রেমের সান্নিধ্যে জীবনের মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন; ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির সান্নিধ্যে মনের দুঃখ, অন্ধকার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন।

কবি যখন প্রকৃতির মধ্যে মনের আনন্দ, দুঃখ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন তখন কবির বিবাহ হয় এবং তার কয়েক মাস পরেই আবার দুঃখের ছায়া নেমে এল খেলার সঙ্গিনী, বৌদি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে। খেলার বয়সে কাদম্বরী বাড়িতে বউ হয়ে আসে এবং চব্বিশ বছর বয়সে সেই সঙ্গিনী চলে গেলে কবির সঙ্গে মৃত্যুর স্থায়ী পরিচয় হয়। ছোটবেলায় মা মারা গেলেও তেমন দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয়নি কবির। কারণ এক দিকে তো ছোট বয়সে মা মারা যায়, আবার মার সঙ্গে তেমন কবির সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। মায়ের সান্নিধ্য খুব কম সময় পেয়েছেন, কিন্তু বৌদি ছিল সেই সাত বছর বয়স থেকে প্রতিটি সময়ের, কাজের, ভালোবাসার সঙ্গী। সেই চির সুখ -দুঃখের সঙ্গিনীর মৃত্যুতে কবির জীবনের প্রতি আশা- ভালবাসা যেন কমে যায়। কবি নিজেই এই কথা ' জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল- পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।"[১৬] এই কথা থেকেই বোঝা যায় বৌদি তাঁর জীবনের কতটা অংশ জুড়ে ছিল এবং কতটা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল বৌদির সঙ্গে।

কবি যখন প্রিয় মানুষের মৃত্যুতে জীবনের আশা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন কবি আবার নতুন করে বাঁচার আশা খুঁজে পেলেন প্রকৃতির মধ্যে –

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"[১৭] (প্রাণ, করি ও কোমল)

কারণ–

"না রে, করিব না শোক,

এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা!”[১৮] (নূতন, কড়ি ও কোমল)

এই সময়ে কবির জীবনে ‘ নূতন’ লোক এসেছিল তাঁর স্ত্রী ভবতারিণী দেবী। যাকে রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসে ‘মৃণালিনী’ নাম দিয়েছিলেন। এইরকম নামকরণ আমরা দেখতে পাই তাঁর ছোটগল্প ‘হৈমন্তী’তে। যেখানে অপু হৈমন্তীকে বিয়ে করার পর ভালোবেসে হৈমন্তীকে ‘ শিশির’ নাম দিয়েছিলেন। এই নামের মধ্যে আছে একান্ত নিজস্বতা, ভালোবাসা, যা তাঁর একান্ত নিজের। মৃণালিনী আসার কয়েক মাস পরেই কাদম্বরী দেবী মারা গেলে সেই সময়ে কিছুদিন একাকীত্বে কাটানোর পরে কবি আবার বাঁচার আশা, ভালোবাসা খুঁজে পায় মৃণালিনীর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের অনেক পত্র-পত্রিকার মধ্যে সেই ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই জন্যই কবি বৌদির শোক ভুলে স্ত্রী মৃণালিনীকে নিয়ে নতুন করে মানবের মাঝে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কখনোই বৌদিকে বা তার প্রতি ভালবাসাকে ভুলে যায়নি রবীন্দ্রনাথ। তার পরিচয় তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘বিস্মৃতি’, সেই ‘বিস্মৃতি’কে নিয়েই কবি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থে কবি প্রকৃত প্রেমের জয়গান করেছেন, যে প্রেম কামনা, বাসনা, রূপ, আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে। ভালোবাসা যেন কোনো আকাঙ্খার ধন নয়, বিরহেই যেন তার সার্থকতা। তাই ‘নিষ্ফল কামনা’য় বলেছেন কবি–

“ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্খার ধন নহে আত্মা মানবের।”[১৯]

প্রকৃত প্রেমের রূপ কেমন হওয়া উচিত, তা ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবি তুলে ধরেছেন। ‘মায়ার খেলা’ নাটকে অমর ও শান্তার মিলন হলে প্রমদা শূন্য হৃদয়ে চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথায় বলেছেন–

“এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায় - এমনি মায়ার ছলনা।”[২০]

এরপর কবিকে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শিলাইদহ, পতিসর, শাজাদপুর জমিদারী পরিদর্শনে যেতে হলে কবি প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়। সেই পল্লী প্রকৃতি কবির মনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার পরিচয় আমরা পাই ‘ছিন্নপত্রে’র মধ্যে; যেগুলো কবি বিভিন্ন সময়ে বন্ধু, ইন্দিরা দেবী, স্ত্রীকে লিখেছিলেন। এর মধ্যে আমরা যদি একটি পত্র নিয়ে আলোচনা করে দেখি তাহলেই বোঝা যাবে প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল। ‘শিলাইদহ’ থেকে লেখা ’৫৫ নং’ পত্রে কবি শরতের সকালের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন,

> “এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা চোখের উপর যে কি সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর, শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নব যৌবনা ধরণী সুন্দরীর সঙ্গে কোন এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে, তাই এই আলো এবং এই বাতাস…জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।”[২১]

সুন্দর সবুজ ক্ষেত, নিস্তব্ধ দুপুর, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের খেলা, গ্রামীন জনপদের বর্ণনা, হাটে যাবার দৃশ্য, চাঁদের বর্ণনা, রাখালের গরু চরানোর ছবি প্রভৃতির অপরূপ বর্ণনা কবি দিয়েছেন। ‘ছিন্নপত্র’ এর প্রতিটি পত্রেই এই প্রকৃতির ছবি ধরা পড়েছে। প্রকৃতির সম্পর্কের গভীর প্রেমের কথা বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যেও ধরা পড়েছে। আমরা যদি তাঁর ‘পল্লীপ্রকৃতি’ প্রবন্ধটিকে দেখি তাহলেই বোঝা যাবে প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর প্রেমের ছবি,

> “পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল খেতে তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিনী।”[২২]

‘শ্রীনিকেতন’, ‘পল্লীসেবা’, ‘উপেক্ষিতা পল্লী’ প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তিনি সেই পল্লী প্রকৃতির উন্নয়নের কথাও বলেছেন। এইসব

বর্ণনার মধ্য দিয়েই বোঝা যায় প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম। এই প্রকৃতি প্রেম থেকেই বিশ্বভারতীর মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার পরিকল্পনা করেন তিনি। এই বর্ণনাগুলি থেকেই বোঝা যায় কবি প্রকৃতিকে কতটা ভালোবাসত এবং প্রকৃতি কবির উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল জীবনে।

'ছিন্নপত্রে'র সময়ের রচিত 'সোনার তরী' কাব্যেও এই প্রকৃতির রূপেরই বর্ণনা পাই। 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় কবি এই প্রকৃতির ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন–

"হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস, পাখিরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে, বিকেলে ঘরের মুখে।"[২৩]

'সোনার তরী' কাব্যে দেখলেই বোঝা যাবে এই কাব্যের উৎস এবং পটভূমি। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাই এই কাব্যের প্রধান বিষয়। প্রকৃতির রূপে, সৌন্দর্যে, মোহে যে কতটা কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেই ভালোবাসার ছবি কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে–

"হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমাপানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে;"[২৪] (বসুন্ধরা, সোনার তরী)

'চিত্রা', 'চৈতালি' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যেও প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসার ছবি লক্ষ্য করা যায়। 'চৈতালি' কাব্যের মধ্যে দেখা যায় গভীর প্রকৃতি প্রেম।

মানুষ যে নিজের ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে শুধু নিজের কিছু স্বার্থের জন্য প্রকৃতিকে বিনষ্ট করছে, এই যন্ত্র সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রাণশক্তিকে কেড়ে নিচ্ছে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। মানুষ যন্ত্রের ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে তাল তাল করে সোনা সংগ্রহ করছে, বাঁধের মাধ্যমে প্রকৃতির জলধারাকে অবরুদ্ধ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছে। আবার 'রক্তকরবী' নাটকের রচনা প্রসঙ্গ যদি দেখা যায়, তাহলেই দেখা যাবে এর বাস্তবতাকে। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকাতে দেখেছিলেন ধনের বড় বেশি ছড়াছড়ি, কিন্তু প্রাণের বড় অভাব। অধ্যাপক রাধাকোমল মুখোপাধ্যায়ও বোম্বাইয়ের শিল্প কেন্দ্রের শ্রমিকদের করুণ অবস্থা দেখে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, সে কথা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে। শ্রমিকদের এই করুণ অবস্থা-ই রবীন্দ্রনাথের মনে আঘাত করেছিল। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জানিয়ে বলেছিলেন–

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর–
লহো তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা।"[২৫] (সভ্যতার প্রতি, চৈতালি)

কাদম্বরী দেবীর প্রতি যে রবীন্দ্রনাথের কতটা ভালবাসা ছিল, সে কথা আমরা পূর্বে দেখেছি। কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতায় তার স্মৃতিচারণ করেছেন। বারবার সেই স্মৃতি, ঘুরে - ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীর ভালোবাসায় সেই শোক ভুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসত তা বিভিন্ন চিঠিপত্রের, লেখনীর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই। সেই ভালোবাসার মানুষটি রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়ে এতদিনের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার সম্পর্কে বলে ওঠেন–

"এ সংসারে এক দিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত,
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ?"[২৬] (১৫নং, স্মরণ)

আবার কবি বলেছেন -

"হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর।
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া।"[২৭] (মুক্তপাখির প্রতি, উৎসর্গ)

মৃত্যু যে প্রিয়জনের থেকে প্রিয় জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে','হৈমন্তী' গল্পের মধ্যে সেই বেদনার সুর শুনতে পাই। 'নিশীথে' গল্পে প্রথম স্ত্রীর প্রতি প্রেম ভালবাসার যে সুমধুর সম্পর্ক দক্ষিণারঞ্জনের ছিল, সে কথা আমরা গল্পের মধ্য দিয়েই দেখতে পাই। কিন্তু মৃত্যুই সেই প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল স্মৃতি শুধু রয়ে গেল মনে। 'হৈমন্তী' গল্পেও এই চিত্র দেখা যায়। হৈমন্তীর প্রতি অপুর ভালবাসা, একসঙ্গে বই পড়া, কিন্তু মৃত্যুই সেই প্রিয় মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার মানুষদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্মৃতিটুকু দিয়ে। আবার দেখা যায় মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অনেকদিন পরে কবি স্ত্রীকে ভুলতে না পেরেই অমলাকে বলেছিলেন,

> "দেখো অমলা মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না।"[২৮]

মরনেও যে প্রেম মরে না, তাইতো কবি বলে উঠেছিলেন–

> "বিশ্বের প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।।"[২৯] (বিচ্ছেদ, মহুয়া)

কবির এই কথা থেকেই বোঝা যায় কবি স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার জন্যই কবির এ কথা মনে হয়েছিল। গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল জন্যই ৪১ - ৪২ বছর বয়সে স্ত্রী মারা যাবার পরেও কবি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে প্রকৃতি, বিশ্বলোকের প্রতি প্রেম কবির সেই শোক ভুলতে সাহায্য করেছিল। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে যেমন কবি এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি এই বিশ্ব প্রকৃতি, কর্ম প্রভৃতি সেই মৃত্যুর শোককে ভুলিয়ে দিয়েছিল। কারণ দেহের বিচ্ছেদ হলেও প্রেমের বিচ্ছেদ হয় না। তাই কবি মনের মধ্যে তাঁর প্রেমিকাকে খুঁজে পেয়েছেন। কালের যাত্রায় কবির ভালোবাসার মানুষ হারিয়ে গেলেও সেই স্মৃতি, সেই ভালোবাসা নিয়েই 'শেষের কবিতায়' লাবণ্যের মধ্য দিয়ে কবি বলেছেন–

> "সেই ধাবম কাল
> জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল–...
> আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।...
> হে বন্ধু, বিদায়।"[৩০]

রবীন্দ্র জীবনে প্রেমের আর একটা দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে মানুষের প্রতি যেমন, দেশের প্রতিও তেমনি প্রেম ছিল কবির মনে। কবির জীবনে যেমন মানব- মানবীর প্রতি প্রেম ছিল, তেমনি দেশের প্রতিও গভীর প্রেম ছিল। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব পাশ হলে সারা দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে ঠাকুর পরিবার তথা রবীন্দ্রনাথও এর বাইরে ছিলেন না। তিনি দেশ মাতার উদ্দেশ্যে বলে উঠেছিলেন, 'তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ'।[৩১] আবার কখনো তিনি গেয়ে উঠলেন–

> "বাংলার মাটি, বাংলার জল
> বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–
> পূণ্য হউক, পূণ্য হউক,
> পূণ্য হউক হে ভগবান।..."[৩২]

আবার তাঁর জাতীয় সংগীতের রচনা প্রভৃতি থেকেই দেখতে পারি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে কতটা ভালোবাসতেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রচনা 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও দেশের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ইংরেজদের দেশবাসীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কবি বলে উঠলেন–

> "আজকে হতে জগৎ মাঝে ছড়াব আমি ভয়, ...
> তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধন ক্ষয়।"[৩৩]

দেশবাসীর মনের মধ্যে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন কবি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। দেশের বন্ধন মোচনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন কবি। সেই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন যে পথে চলছিল, সেই পথ যে ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস মাত্র তা 'গোরা', 'ঘরে- বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন ভন্ড দেশপ্রেমিকদের স্বদেশী আন্দোলনের নামে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে। 'গোরা' উপন্যাসে গোরা ও তার অনুচরদের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয়হীনতা, উচ্ছ্বাস আর ব্যর্থতা। 'ঘরে- বাইরে'

উপন্যাসেও দেখা যায় সন্দীপের ভন্ড দেশ প্রেমের পাশাপাশি নিখিলেশ, মাস্টারমশাইয়ের প্রকৃত দেশের লোকের প্রতি, দেশের প্রতি প্রেমকে। তাইতো সন্দীপ যখন জোর করে, লোভ দেখিয়ে, অত্যাচার করে বিলেতি দ্রব্য বয়কট করতে সাধারণ মানুষদের বাধ্য করতে চেয়েছিল, তখন মাস্টারমশাই বলে ওঠে,

> "তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরেই।...ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"[৩৪]

সেই সময়ে যে এইরকম স্বদেশী আন্দোলন চলছিল প্রকৃত দেশের অবস্থা, জনগণের অবস্থার কথা না জেনে - বুঝে ভন্ড যে দেশ প্রেমের আদর্শ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বোঝায় যায় মাস্টারমশাইয়ের এই কথার মধ্য দিয়ে।

পরিণত বয়সে এসেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ সবকিছু ছেড়ে প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে সবুজ শস্যক্ষেত্র, গরু চরে, রাজহংস বিচরণ করে সেখানে যেতে চেয়েছেন-

> "আমার মন বসবে না আর - কোথাও,
> সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
> চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
> ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।"[৩৫] (বাসা, পুনশ্চ)

'বলাই' গল্পের মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন প্রকৃতির প্রতি এমনই প্রেম - ভালোবাসার ছবি,

> "এতটুকু - টুকু লতা, বেগনি, হলদে নামহারা ফুল, অতি ছোট ছোট; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালোমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে - খাওয়া নিম ফলের বিচি পড়ে ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা-..."[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ এই যে প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন বলাই এর মধ্য দিয়ে, যে প্রকৃতি প্রেমের কথা তুলে ধরেছেন, তা আসলে তাঁরই মনের কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে কতটা ভালবাসতেন, তা আমরা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করতে পারি। সেই প্রকৃতি প্রেমই তিনি বলাই এর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই ছোট্ট বলাই আর কেউ নয়, সেই ছোট্ট রবীন্দ্রনাথই। শেষ জীবনে এসেও কবি গেয়ে গেছেন প্রকৃতির রূপের গান -

> "অরুণ আলোর প্রথম পরশ
> গাছে গাছে লাগে,
> কাঁপনে তার তোরই সে সুর
> পাতায় পাতায় জাগে-"[৩৭] (৩ নং, শেষ লেখা)

একই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থেকে কবি বলে উঠেছিলেন -

> "বিবাহের প্রথম বৎসরে
> দিকে দিগন্তরে
> শাহনায় বেজেছিল বাঁশি,
> উঠেছিল কল্লোলিত হাসি,"[৩৮] (৮ নং, শেষ লেখা)

এ থেকেই বোঝা যায়, কবির জীবনে প্রিয় মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল। মৃত্যুর শেষ সীমানায় দাঁড়িয়েও কবি তাঁর প্রকৃতি ও প্রিয় মানুষকে ভুলতে পারেননি। বারবার তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রিয় মানুষের প্রতি ভালোবাসা, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার ছবি উঠে এসেছে, যা তাঁর জীবনে শেষ সময় পর্যন্ত ছিল।

এই আলোচনা থেকে দেখায় যায়, ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ছোট্ট রবি সেই দোতলার জানালা থেকে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতেন, সেই প্রকৃতিই প্রিয় মানুষদের বিচ্ছেদের সময় বারবার তাকে রাস্তা দেখিয়েছে নতুন করে বাঁচার। প্রথম জীবনে আন্না তরখড় প্রতি প্রেম থেকে শুরু করে বিলেতে ডাক্তারের কন্যাদ্বয়ের প্রতি প্রেম, তারপর বৌদি কাদম্বরী দেবীর প্রতি প্রেম এবং

কাদম্বরীর মৃত্যুর পর স্ত্রী রূপে মৃণালিনী দেবীর প্রতি প্রেম, মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি প্রেম, তার সঙ্গে এসেছে প্রকৃতি। বারবার কবির জীবনে নানা রূপে, নানা ভাবে এসেছে প্রেম ও প্রকৃতি। বারবার প্রিয় মানুষদের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে পড়লে এই প্রেম ও প্রকৃতি নানা ভাবে এসে তাঁকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে, যুগিয়েছে আশা। তাহলে বলায় যায় এই প্রেম ও প্রকৃতি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ: ২২০
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৪, পৃ: ১২
৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ:৮৮
৪. তদেব, পৃ: ৮৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পৌষ, ১৪১০, পৃ: ১১৬
৬. তদেব, পৃ: ১১৯
৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ: ৯৩
৮. তদেব, পৃ: ৯৪
৯. তদেব, পৃ: ১১১
১০. তদেব, পৃ: ১১৪
১১. তদেব, পৃ: ১১৮
১২. তদেব, পৃ: ১২৫
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত সঙ্গীত, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, পাঁচকড়ি মিত্র (প্রকাশক), ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, ১২৯৩, পৃ: ৯
১৪. তদেব, পৃ: ১৩
১৫. চক্রবর্তী, অঞ্জন, সূর্যপ্রণাম, নিউ বইপত্র, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ২০২০, পৃ: ১৫০
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৪, পৃ: ১৫০
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল, শ্রী আশুতোষ চৌধুরী সম্পাদিত, ৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট, পীপলস লাইব্রেরি, কলকাতা, ১২৯৩
১৮. তদেব, পৃ: ১০
১৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬, পৃ: ২৫৭
২০. তদেব, পৃ: ২৩৯
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬২, পৃ: ১২৫
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯৩, পৃ: ৪৬
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৮৪, পৃ: ৬৪
২৪. তদেব, পৃ: ১৮৫
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চৈতালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭, পৃ: ৩৬
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্মরণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ: ২৪
২৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪২৬, পৃ: ৬১
২৮. তদেব, পৃ: ৫৯
২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মহুয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৩, পৃ: ১৪৩

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, ১৪২৬, পৃ: ৬৯৫-৬৯৬
৩১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪২৬, পৃ: ১৬৪
৩২. তদেব, পৃ: ১৬৮
৩৩. তদেব, পৃ: ১৯০
৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ: ৭২-৭৩
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৪২৮, পৃ: ৪৪
৩৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৮, পৃ: ৬৫৮
৩৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ লেখা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ: ১২
৩৮. তদেব, পৃ: ২১

গ্রন্থপঞ্জী:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪২৬
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৪
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পৌষ, ১৪১০
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত সঙ্গীত, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, পাঁচকড়ি মিত্র (প্রকাশক), ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, ১২৯৩
৫. চক্রবর্তী, অঞ্জন, সূর্যপ্রণাম, নিউ বইপত্র, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ২০২০
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কড়ি ও কোমল, শ্রী আশুতোষ চৌধুরী সম্পাদিত, ৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট, পীপলস লাইব্রেরি, কলকাতা, ১২৯৩
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক, ১৩৬২
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯৩
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৮৪
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চৈতালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্মরণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৮
১২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৪২৬
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মহুয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬৩
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), এস. বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, ১৪২৬
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ১৪২৩
১৬ . ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৪২৮
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, এস.বি. এস. পাবলিকেশন, ৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ১৪২৮
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ লেখা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৯৩
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দশম খন্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৮-২০১৯